ভাববার কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ।

১৩১৪

মূল্য ।/০ আনা।

সূচীপত্র।

ভাব্‌বার কথা।

হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত "বেদ" বুঝা যায়। ধর্ম্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য, যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

"সত্য" দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বিজ্ঞান" বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে "বেদ" বলা যায়।

"বেদ" নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতেছেন।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম "বেদ"।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্ম্মানুভূতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন "ধর্ম্ম" কেবল "কথার কথা" ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ কাল পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র "বেদ"।

অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্ম্মপুস্তক-সমূহে যদিও বর্ত্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্ব-প্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ "বেদ" নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণ-ভূমি।

আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দরাশির

সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই "বেদ"।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতি-নীতিও এই কর্ম্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচার সকলও সৎশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়া গৃহীত হইবে। সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্ত্তী হওয়াই আর্য্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই নিষ্কামকর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশ, কাল, পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায় সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশকালপাত্র-ভেদে অধিক ভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র, বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত বর্ণন মুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত

ব্যাখ্যান করিতেছেন ; এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্য্যসন্তান, এই সকল ভাব-বিশেষের বিশেষ-শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্ম্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্য্যজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি ? এবং সতত-বিবদমান আপাত-প্রতীয়মান বহুধা-বিভক্ত সর্ব্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় ? এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ, স্বীয় জীবনে

নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ লোকের হিতের জন্য আপনাকে প্রদর্শন করিতে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি বর্ত্তমান সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কর্ত্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে, এই জন্য বেদমূর্ত্তি ভগবান্ এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান্ বারম্বার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়; প্রত্যেক পতনের পর আর্য্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্য্যবান্ হইতেছে। ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ, অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং

সর্ব্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদ-রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

এবং সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

পতনাবস্থায় সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র ভাব সমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশে লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে, নব বলে বলীয়ান্ মানবসন্তান, বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিদ্যারও

পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে ; ইহার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ, শ্রীভগবান্ পরম কারুণিক, সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাবসমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহায়, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান ; এবং এই নব যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সেরূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। মৃতদেহের পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয়

হইতে, সত্যোন্মিষিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষ মাত্রে দিগ্ দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক; এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

বাঙ্গালা ভাষা।

(রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত উদ্বোধন পাক্ষিক পত্রের সম্পাদককে লিখিত।)

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা "লোকহিতায়" এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি—কিস্তূত কিমাকার—উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?

যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ একচাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়্‌ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব্ব পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়, তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা লিখ্‌তে হবে।

যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব্ব পশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ এক কলকেতার ভাষাই রাখ্বে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্তে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ কর্বেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর, বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ; আর অর্ব্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখুনি বুঝ্তে পার্বে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়; মরে গেলে, মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু একটা

পশ্চাতাপ রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে, সে কি ধুম্—দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্ করে—"রাজা আসীৎ"!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থাম্‌গুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে, ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা পাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধুম্!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে,—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝ্‌তে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম্! সে কি আঁকা বাঁকা ডামাডোল্—ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এ গুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন,—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত—কোনও কাজের নয়। এখন বুঝ্‌বে যে, জাতীয় জীবনে যেমনযেমন বল আস্‌বে, তেমন তেমন ভাষা

শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা' দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্ত্তি দেখ্‌লেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়ে মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্‌ মগ্‌ করবে।

বর্ত্তমান সমস্যা।

(উদ্বোধনের প্রস্তাবনা।)

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্ব্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস অর্থাৎ রাজা রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম ক্রোধ ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্র হয়ত প্রাচীন ভারতের একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্য্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান্‌-অপ্রতিহতবুদ্ধি—নানাভাবপরিচালিত—একটী অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতিছত্রে তাহার প্রতিপদ-বিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা, লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগ-

যুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই জাতি, মধ্য-আসিয়া, উত্তর ইয়োরোপ বা সুমেরু-সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে, শনৈঃশনৈঃপ্রকারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারতবহির্ভূত-দেশবিশেষনিবাসী একটী বিরাট জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন—কতিপয় ইউরোপীয় ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই সকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন্ জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এ সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই।

তবে, যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে,

যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে—সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর—মানসপুত্র—তাঁহাদের ভাবরাশির—চিন্তারাশির—উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, অপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় সূত্রে, ভারতীয়চিন্তা-রুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে। হয়ত আমাদের ভাগ্যে সার্ব্বভৌমিক পৈতৃকসম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবিভূষিত একটী ক্ষুদ্রদেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশী-সমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল অধ্যবসায়সহায়, পার্থিব-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব্বক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন।

অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে যবন বলিত; ইঁহাদের নিজনাম—গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্য্যশালী জাতি এক অপূর্ব্বদৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্য্যাদি শিল্পে—অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের

ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; অথবা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্দ্ধা অনুভব করিতেছি।

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমন কি, একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীকমনের সৃষ্টি।"

সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্ব্বতসমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; এবং যখনই ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্তোলিত সভ্যতারেখা সুদূরসম্প্রসারিত, এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরাণী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্দ্ধভূভাগ ঈশাদি নামাখ্যাত আধ্যাত্মতরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের

সভ্যতার সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে; এবং বোধ হয় আধুনিক সময়ে পুনরায় ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীরচিন্তা, অপরের অদম্যকার্য্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ,' অপরের 'ভোগ'; একের সর্ব্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ব্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোককল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্ত্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।

এ যুগে পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্ত্তমান।

ইউরোপ আমেরিকা, যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্য্যকুলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারত-

বাসীদেরও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে ?

পুনর্ব্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরল মেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে পুনর্ব্বার রন্তিদেবের কীর্ত্তির পুনরুদ্দীপন হইবে ? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে সমগ্র ভারত একটী বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে ? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে ? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে ?—গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে ? জাতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে বা মান্দ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে ? অথবা পাঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে ? বর্ণভেদে যৌন সম্বন্ধ মনূক্ত ধর্ম্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃ প্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় এক বর্ণ মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে ? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমন

কি, একই দেশে, জাতি এবং বংশ ভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্ম নির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই,—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায়-সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তিসঞ্চার আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়

যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয় ? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটী কোটী নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে ?

এ পেষণেরই বা কি ফল ?

দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্ম্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্ব্বিতচর্ব্বণে, এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্ত্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাব

পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ-শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণ প্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা "উদ্বোধনের" জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্য্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়—ভয় হয় পাছে অসাধ্য

অন্তর এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙে অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই—

এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহাতে—আপামর সাধারণ—সকলে তাঁহাদের পিতৃধন সর্ব্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রবন্ধ করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক্ হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্য্যবান্, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?

কত পর্ব্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুরতরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ, দেশদেশান্তর হইতে কত সাধুহৃদয়, ওজস্বিমস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া—নর-রঙ্গক্ষেত্র কর্ম্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোতবাহন ও তড়িৎসহায়—ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি, দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে—ক্রোধ-কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া

গিয়াছে, এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। য-
দ্‌ জল হইতে মৃতজীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্য্যন্ত সকলই
বহু বাগাড়ম্বরসত্ত্বেও, নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল ; আইনের
প্রবল প্রভাবে, ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও
অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে—রাখিবার শক্তি
নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন?
"সত্যমেব জয়তে নানৃতং"।—এই বেদবাণী কি মিথ্যা?
অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপ-
প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই আচারগুলিই অনাচার
ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।

"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়"। নিঃস্বার্থভাবে ভক্তি-
পূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য "উদ্বোধন,"
সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং
দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত
কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই
আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে ; কেবল
আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ ! আমাদিগকে ওজস্বী কর ;
হে বীর্য্যস্বরূপ ! আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর ; হে বল-
স্বরূপ ! আমাদিগকে বলবান্ কর।

জ্ঞানার্জ্জন।

ব্রহ্মা—দেবতাদিগের প্রথম ও প্রধান, শিষ্য-পরম্পরা
জ্ঞান প্রচার করিলেন ; উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী কাল
চক্রের মধ্যে কতিপয় অলৌকিক সিদ্ধপুরুষ—জিনে
প্রাদুর্ভাব হয় ও তাঁহাদের হইতে মানব-সমাজে জ্ঞানে
পুনঃ পুনঃ স্ফূর্ত্তি হয় ; সেই প্রকার বৌদ্ধমতে সর্ব্ব
বুদ্ধনামধেয় মহাপুরুষদিগের বারম্বার আবির্ভাব ; পৌরাণি
দিগের অবতারের অবতরণ, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বিশে
রূপে, অন্যান্য নিমিত্ত অবলম্বনেও ; মহামনা স্পিতাম
জরতুষ্ট্র জ্ঞানদীপ্তি মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিলেন ; মুসা
মুসা, ঈশা ও মহম্মদও তদ্বৎ অলৌকিক উপায়শালী হইয়
অলৌকিক পথে অলৌকিক জ্ঞান মানব সমাজে প্রচা
করিলেন।

কয়েক জন মাত্র জিন হন, তাহা ছাড়া আর কাহার
জিন হইবার উপায় নাই, অনেকে মুক্ত হন মাত্র ; বু
দ্ধিক অবস্থা সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারেন ; ব্রহ্মাদি—

পদবী মাত্র, জীবমাত্রেরই হইবার সম্ভাবনা ; জরথুষ্ট্র, মুসা, ঈশা, মহম্মদ—লোক-বিশেষ, কার্য্যবিশেষের জন্য অবতীর্ণ তদ্বৎ, পৌরাণিক অবতারগণ ; সে আসনে অন্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ বাতুলতা। আদম্ ফল খাইয়া জ্ঞান পাইলেন, 'নু' (Noah) জিহোবাদেবের অনুগ্রহে সামাজিক শিল্প শিখিলেন। ভারতে সকল শিল্পের অধিষ্ঠাতা—দেবগণ বা সিদ্ধপুরুষ ; জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্তই অলৌকিক পুরুষদিগের কৃপায় 'গুরু বিন্ জ্ঞান নহি'; শিষ্য পরম্পরায় ঐ জ্ঞানবল গুরু-মুখ হইতে না আসিলে, গুরুর কৃপা না হইলে, আর উপায় নাই।

আবার দার্শনিকেরা—বৈদান্তিকেরা—বলেন, জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধন—আত্মার প্রকৃতি ; এই মানবাত্মাই অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাহাকে আবার কে শিখাইবে ? কুকর্ম্মের দ্বারা, ঐ জ্ঞানের উপর যে একটা আবরণ পড়িয়াছে, তাহা কাটিয়া যায় মাত্র। অথবা ঐ 'স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞান' অনাচারের দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ঈশ্বরের কৃপায় সদাচারের দ্বারা পুনর্বিস্ফারিত হয়। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা, ঈশ্বরে ভক্তির দ্বারা, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা, জ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা, অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ—ইহাও পড়া যায়।

আধুনিকেরা অপরদিকে, অনন্তস্ফূর্ত্তির আধারস্বরূপ মানব-মন দেখিতেছেন, উপযুক্ত দেশকালপাত্র পরম্পরের উপর ক্রিয়াবান্ হইতে পারিলেই জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইবে, ইহাই সকলের ধারণা। আবার দেশকালের বিড়ম্বনা পাত্রের তেজে অতীত হওয়া যায়। সৎপাত্র, কুদেশে, কুকালে পড়িলেও বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শক্তি বিকাশ করে। পাত্রের উপর, অধিকারীর উপর যে সমস্ত ভার চাপান হইয়াছিল, তাহাও কমিয়া আসিতেছে। সেদিনকার বর্ব্বর জাতিরাও যত্ন-গুণে সুসভ্য ও জ্ঞানী হইয়া উঠিতেছে—নিম্নস্তর উচ্চতম আসন অপ্রতিহত গতিতে লাভ করিতেছে। নিরামিষ-ভোজী পিতামাতার সন্তানও সুবিনীত, বিদ্বান্ হইয়াছে, সাঁওতাল-বংশীয়েরাও ইংরাজের কৃপায় বাঙ্গালির পুত্রদিগের সহিত বিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থাপন করিতেছে। পিতৃ-পিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিত্ব ঢের কমিয়া আসিয়াছে।

একদল আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস—প্রাচীন মহাপুরুষদিগের অভিপ্রায় পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত পথে তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকল বিষয়ের জ্ঞানের একটি নির্দ্দিষ্ট ভাণ্ডার অনন্ত কাল হইতে আছে, ঐ খাজানা পূর্ব্বপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তরাধিকারী

জগতের পূজ্য। যাঁহাদের এপ্রকার পূর্ব্বপুরুষ নাই তাঁহাদের উপায়? কিছুই নাই। তবে যিনি অপেক্ষাকৃত সদাশয়, উত্তর দিলেন—আমাদের পদলেহন কর, সেই সুকৃত ফলে আগামী জন্মে আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে।—আর যে আধুনিকেরা বহুবিদ্যার আবির্ভাব করিতেছেন—যাহা তোমরা জান না এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে জানিতেন, তাহারও প্রমাণ নাই? পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন বৈকি, তবে লোপ হইয়া গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ—।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদী আধুনিকেরা এ সকল কথায় আস্থা প্রকাশ করেন না।

অপরা ও পরা বিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত, একের দ্বারা অন্যের না হইতে পারে, এক উপায় অবলম্বনে সকল প্রকার জ্ঞান-রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইতে পারে, কিন্তু সে বিশেষত্ব (difference) কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থা-ভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন-ভেদ, বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত।

'জ্ঞান-মাত্রেই পুরুষ-বিশেষের দ্বারা অধিকৃত, এবং এ

সকল বিশেষ পুরুষ ঈশ্বর বা প্রকৃতি বা কর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট হইয়া যথাকালে জন্মগ্রহণ করেন; তদ্ভিন্ন কোনও বিষয়ে জ্ঞান-লাভের আর কোন উপায় নাই, এইটি স্থির সিদ্ধান্ত হইলে সমাজ হইতে উদ্যোগ উৎসাহাদি অন্তর্হিত হয়, উদ্ভাবনী শক্তি চর্চ্চাভাবে ক্রমশঃ বিলীন হয়, নূতন বস্তুতে আর কাহারও আগ্রহ হয় না, হইবার উপায়ও সমাজ ক্রমে বন্ধ করিয়া দেন। যদি ইহাই স্থির হইল যে, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ-বিশেষগণের দ্বারায় মানবের কল্যাণের পন্থা অনন্ত কালের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে সেই সকল নির্দ্দেশের রেখা-মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ হইবার ভয়ে সমাজ কঠোর শাসন দ্বারা মনুষ্যগণকে ঐ নির্দ্দিষ্ট পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যদি সমাজ এ বিষয়ে কৃত-কার্য্য হয়, তবে মনুষ্যের পরিণাম, যন্ত্রের ন্যায় হইয়া যায়। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই যদি অগ্র হইতে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তবে চিন্তাশক্তির পর্য্যালোচনার আর ফল কি? ক্রমে ব্যবহারের অভাবে উদ্ভাবনীশক্তির লোপ ও তমো-গুণপূর্ণ জড়তা আসিয়া পড়ে; সে সমাজ ক্রমশই অধো-গতিতে গমন করিতে থাকে।

অপরদিকে, সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দেশবিহীন হইলেই যদি কল্যাণ হইত, তাহা হইলে চীন, হিন্দু, মিসর, বাবিল

ইরাণ, গ্রীস, রোম ও তাহাদের বংশধরদিগকে ছাড়িয়া সভ্যতা ও বিদ্যাশ্রী, যুলু কাফ্রি, হটেন্‌টট্‌, সাঁওতাল, আন্দামানি ও অষ্ট্রেলীয়ান্ প্রভৃতি জাতিগণকেই আশ্রয় করিত।

অতএব মহাপুরুষদিগের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পথেরও গৌরব আছে, গুরু-পরম্পরাগত জ্ঞানেরও বিশেষ বিশেষত্ব আছে, জ্ঞানের সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বও একটি অনন্ত সত্য। কিন্তু বোধ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজনদিগের অভিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্য্য-স্মরণেই কালাতিপাত করে, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভক্তিপ্রবণ হৃদয় সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্বপুরুষদিগের পদে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া যায়, এবং পরবর্ত্তী কালে ঐ দুর্ব্বলতাই শক্তিহীন গর্ব্বিত হৃদয়কে পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব-ঘোষণরূপ জীবনাধার-মাত্র অবলম্বন করিতে শিখায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষেরা সমুদায়ই জানিতেন, কাল-বশে সেই জ্ঞানের অধিকাংশই লোপ হইয়া গিয়াছে, একথা সত্য হইলেও ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, ঐ লোপের কারণ, পরবর্ত্তীদের নিকট ঐ লুপ্ত জ্ঞান থাকা না থাকা সমান

নূতন উদ্যোগ করিয়া, পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিয়া তাহা আবার শিখিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে বিশুদ্ধচিত্তে আপনা হইতেই স্ফূর্ত্ত হয়, তাহাও চিত্তশুদ্ধিরূপ বহু আয়াস ও পরিশ্রমসাধ্য; আধিভৌতিক জ্ঞানে,যে সকল গুরুতর সত্য মানব-হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইয়াছে, অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সেগুলিও সহসা উদ্ভূত দীপ্তির ন্যায় মনিষীদের মনে সমুদিত হইয়াছে, কিন্তু বন্য অসভ্য মনুষ্যের মনে তাহা হয় না, ইহাই প্রমাণ যে, আলোচনা ও বিদ্যাচর্চ্চারূপ কঠোর তপস্যাই তাহার কারণ।

অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জ্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের তারতম্যে।

মহাপুরুষত্ব, ঋষিত্ব, অবতারত্ব বা লৌকিক-বিদ্যায় মহাবীরত্ব সর্ব্বজীবের মধ্যে আছে, উপযুক্ত গবেষণা ও কালাদি সহায়ে তাহা প্রকাশিত হয়। যে সমাজে ঐ প্রকার বীরগণের একবার প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে, সেথায় পুনর্ব্বার মনীষিগণের অভ্যুত্থান অধিক সম্ভব। গুরুসহায়-সমাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু গুরুহীন সমাজে কালে গুরুর উদয় ও জ্ঞানের বেগপ্রাপ্তি তেমনই নিশ্চিত।

পারিস-প্রদর্শনী।

(লেখক—স্বয়ং বক্তা।)

কয়েক দিবস যাবৎ পারিস (paris) মহাপ্রদর্শনীতে "কংগ্রে দ'লিস্তোয়ার-দে রিলিজিঅঁ" অর্থাৎ ধর্মেতিহাস নামক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় অধ্যাত্মবিষয়ক এবং মতামত সম্বন্ধী কোনও চর্চ্চার স্থান ছিল না, কেবল মাত্র বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গ সকলের তথ্যানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এ বিধায়, এ সভায় বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রচারক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একান্ত অভাব। চিকাগো-মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার ছিল। সুতরাং সে সভায় নানা দেশের ধর্ম্মপ্রচারক মণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় জন কয়েক পণ্ডিত, যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ক চর্চ্চা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন। এবার এখানে ধর্ম্মসভা না হইবার কারণ এই যে, চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়, বিশেষ উৎসাহে, যোগদান করিয়াছিলেন;—মনে করিয়াছিলেন

প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার করিবেন, এবং সমগ্র খৃষ্টান জগৎ, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্বমহিমা নির্বিঘ্নে ও সুন্দররূপে কীর্ত্তন করতঃ বিশেষ ফললাভ করিবেন। কিন্তু ফল অন্যরূপ হওয়ায়, খৃষ্টান-সম্প্রদায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছেন; ক্যাথলিকরা এখন ইহার বিশেষ বিরোধী। ফ্রান্স—ক্যাথলিক-প্রধান; অতএব, যদিও কর্ত্তৃপক্ষদের যথেষ্ট বাসনা ছিল, তথাপি সমগ্র ক্যাথলিক-জগতের বিপক্ষতায়, ধর্ম্মসভা করা হইল না।

যে প্রকার, মধ্যে মধ্যে Congress of orientalist অর্থাৎ সংস্কৃত, পালী, আরব্যাদি ভাষাভিজ্ঞ বুধমণ্ডলীর মধ্যে মধ্যে উপবেশন হইয়া থাকে, সেইরূপ, উহার সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রত্নতত্ব যোগ দিয়া, প্যারিসে এ ধর্ম্মেতিহাস সভা আহূত হয়।

জম্বুদ্বীপ হইতে কেবল মাত্র দুই তিন জন জাপানি-পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ।

বৈদিক ধর্ম্ম ও অগ্নি সূর্য্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড় বস্তুর আরাধনা সমুদ্ভূত, এইটি অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞের মত।

স্বামী বিবেকানন্দ, উক্ত মত খণ্ডন করিবার জন্য, প্যারি-ধর্মেতিহাস সভা কর্তৃক আহূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি উক্ত বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক প্রবল অসুস্থতা নিবন্ধন প্রবন্ধাদি লেখা ঘটিয়া উঠে নাই; কোনও মতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন মাত্র। উপস্থিত হইলে ইউরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; এবং উঁহারা ইতিপূর্ব্বেই স্বামীজির রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

সে সময় উক্ত সভায় ওপর্ট নামক এক জর্ম্মাণ্ পণ্ডিত শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শালগ্রামের উৎপত্তি "যোনি" চিহ্ন বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার মতে শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন এবং তদ্বৎ শালগ্রাম শিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন। শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম উভয়ই লিঙ্গ-যোনি পূজার অঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত মতদ্বয়ের খণ্ডন করিয়া বলেন যে, শিবলিঙ্গের নরলিঙ্গতা সম্বন্ধে অবিবেক মত প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু শালগ্রাম সম্বন্ধে এ নবীন মত অতি আকস্মিক।

স্বামীজি বলেন যে, শিবলিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি অথর্ববেদ সংহিতার প্রসিদ্ধ যূপ-স্তম্ভের স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে

অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে। এবং উক্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি, ধূম, ভস্ম, শিখা, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ, যে প্রকার মহাদেবের অঙ্গ-কান্তি, পিঙ্গজটা, নীলকণ্ঠ, বৃষবাহনত্বাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপ স্তম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।

অথর্ববেদ-সংহিতায় তদ্বৎ যজ্ঞোচ্ছিষ্টেরও ব্রহ্মত্বে মহিমা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

লিঙ্গ পুরাণে উক্ত স্তম্ভকেই কথাচ্ছলে বর্ণনা করিয়া মহাস্তম্ভের মহিমা ও মহাদেবের প্রাধান্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরে হইতে পারে যে, বৌদ্ধাদির প্রাদুর্ভাব কালে বৌদ্ধস্তূপসমাকৃতি দরিদ্রার্পিত ক্ষুদ্রাবয়ব স্মারক স্তূপও সেই স্তম্ভে অর্পিত হইয়াছে। যে প্রকার, অদ্যাপিও ভারতখণ্ডে কাশ্যাদি তীর্থস্থলে অপারক ব্যক্তি অতি ক্ষুদ্র মন্দিরাকৃতি উৎসর্গ করে, সেই প্রকারে বৌদ্ধরাও ধনাভাবে অতি ক্ষুদ্র স্তূপাকৃতি বুদ্ধদেবের উদ্দেশে অর্পণ করিত।

বৌদ্ধস্তূপের অপর নাম ধাতুগর্ভ। স্তূপ মধ্যে শিলা-করণ্ড মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ভস্মাদি রক্ষিত হইত। তৎসঙ্গে স্বর্ণাদি ধাতুও প্রোথিত হইত। শালগ্রাম শিলা উক্ত অস্থি-ভস্মাদি রক্ষণ-শিলার প্রাকৃতিক প্রতিরূপ।

অতএব প্রথমে বৌদ্ধ-পূজিত হইয়া, বৌদ্ধ মতের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নর্ম্মদাকূলে ও নেপালে বৌদ্ধপ্রাবল্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল। প্রাকৃতিক নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ ও নেপাল-প্রসূত শালগ্রামই যে বিশেষ সমাদৃত, ইহাও বিবেচ্য।

শালগ্রাম সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা অতি অশ্রুতপূর্ব্ব এবং প্রথম হইতেই অপ্রাসঙ্গিক; শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌন ব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি অর্ব্বাচীন এবং উক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময় সংঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোর বৌদ্ধ তন্ত্র সকল এখনও নেপালে ও তিব্বতে খুব প্রচলিত।

অন্য এক বক্তৃতা স্বামীজি ভারতীয় ধর্ম্মমতের ধর্ম্মবিস্তার বিষয়ে দেন। তাহাতে বলা হয় যে, বৌদ্ধাদি সমস্ত ভারতীয় ধর্ম্ম-মতের উৎপত্তি বেদে। সকল মতের বীজ তন্মধ্যে প্রোথিত আছে। সেই বীজকে বিস্তৃত ও উন্মীলিত করিয়া বৌদ্ধাদি মতের সৃষ্টি, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মও ঐ সকলের বিস্তার। সমাজের বিস্তার ও সঙ্কোচের সহিত সে বীজ কোথাও বিস্তৃত, কোথাও সঙ্কুচিত হইয়া বিরাজমান আছে। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলেন। এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বলেন যে, যে প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাজকুলাদির ইতিহাস ক্রমশঃ প্রত্নতত্ত্ব

উদ্ঘাটনের সহিত প্রমাণীকৃত হইতেছে, সেই প্রকার ভারতের কিম্বদন্তী সমস্ত সত্য। বৃথা প্রবন্ধ কল্পনা না করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেন উক্ত কিম্বদন্তীর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলর এক পুস্তকে লিখিতেছেন যে, যতই সৌসাদৃশ্য থাকুক না কেন, যতক্ষণ না ইহা প্রমাণিত হইবে যে, কোনও গ্রীক্ সংস্কৃত ভাষা জানিত, ততক্ষণ সপ্রমাণ হইল না যে ভারতবর্ষের সাহায্য প্রাচীন গ্রীস্ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত, ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটী সংজ্ঞা, গ্রীক্ জ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া, এবং গ্রীকেরা ভারতপ্রান্তে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, সমগ্র ভারতের উপর, ভারতের সাহিত্যে, জ্যোতিষে, গণিতে, গ্রীক্ সহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতি সাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীকদের বিদ্যার ছায়া !!

এক "ম্লেচ্ছা বৈ যবনাঃ তেষু এষা বিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে......"

এই শ্লোকের উপর কতই না পাশ্চাত্যেরা কল্পনা চালাইয়াছেন। উক্ত শ্লোকে কি প্রকারে প্রমাণীকৃত হইল যে আর্য্যেরা ম্লেচ্ছের নিকট শিখিয়াছেন; ইহাও বলা

যাইতে পারে যে, উক্ত শ্লোকে আর্য্যশিষ্য-ম্লেচ্ছদিগকে উৎসাহবান্ করিবার জন্য বিদ্যার আদর প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, "গৃহে চেৎ মধু বিন্দেত, কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ?" আর্য্যদের প্রত্যেক বিদ্যার বীজ বেদে রহিয়াছে। এবং উক্ত কোনও বিদ্যার বৈদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদই দেখান যাইতে পারে। এ অপ্রাসঙ্গিক যবনাধিপত্যের আবশ্যকতাই নাই।

তৃতীয়তঃ, আর্য্য জ্যোতিষের প্রত্যেক গ্রীক্‌সদৃশ শব্দ সংস্কৃত হইতে সহজেই ব্যুৎপন্ন হয়; উপস্থিত ব্যুৎপত্তি ত্যাগ করিয়া, যাবনিক ব্যুৎপত্তি গ্রহণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের যে কি অধিকার, তাহাও বুঝি না।

ঐ প্রকার কালিদাসাদিকবিপ্রণীত নাটকে যবনিকা শব্দের উল্লেখ দেখিয়া, যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্য নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে আর্য্যনাটক গ্রীক্‌নাটকের সদৃশ কি না? যাঁহারা উভয় ভাষার নাটক রচনা প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঐ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিন্‌কালেও বর্ত্তমানত্ব নাই। সে গ্রীস্ কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক্ যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে,

আর্য্যনাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্য্যনাটকের আর এক।

আর্য্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীক্ নাটকে আদৌ ত নাই, বরং সেক্সপীয়রপ্রণীত নাটকের সহিত ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে।

অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সেক্সপীয়র সর্ব্ব বিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

শেষ, পণ্ডিত মোক্ষমূলরের আপত্তি তাঁহার নিজের উপরই প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে কোনও হিন্দু কোনও কালে গ্রীক্ ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণও গ্রীক্ প্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

তদ্বৎ আর্য্য-ভাস্কর্য্যে গ্রীক্ প্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রমমাত্র।

স্বামীজি শ্রীকৃষ্ণারাধনা যে বৌদ্ধাপেক্ষা অতি প্রাচীন তাহাও বলেন, এবং গীতা যদি মহাভারতের সমসাময়িক না হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষাও প্রাচীন, নবীন কোনও মতে নহে। গীতার ভাষা, মহাভারতের ভাষা, এক। গীতায় যে সকল বিশেষণ অধ্যাত্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই বনাদি পর্ব্বে বৈষয়িক সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ঐ সকল শব্দের প্রচুর প্রচার না হইলে, এমন ঘটা

অসম্ভব। পুনশ্চ সমস্ত মহাভারতের মত আর গীতার মত একই; এবং গীতা যখন, তৎসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়েরই আলোচনা করিয়াছেন, তখন বৌদ্ধদের উল্লেখ মাত্রও কেন করেন নাই?

বৌদ্ধপর যে কোনও গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হইতেছে না। কথা, গল্প, ইতিহাস বা কটাক্ষের মধ্যে কোথাও না কোথাও বৌদ্ধমতের বা বুদ্ধের উল্লেখ প্রকাশ্য বা লুক্কায়িত রহিয়াছে,—গীতার মধ্যে কে সে প্রকার দেখাইতে পারেন? পুনশ্চ গীতা ধর্ম্মসমন্বয় গ্রন্থ, সে গ্রন্থে কোনও মতের অনাদর নাই, সে গ্রন্থকারের সাদর বচনে এক বৌদ্ধ মতই বা কেন বঞ্চিত হইলেন, ইহার কারণ প্রদর্শনের ভার কাহার উপর?

গীতায় উপেক্ষা কাহাকেও করা হয় নাই। ভয়?—তাহারও একান্ত অভাব। যে ভগবান্ বেদপ্রচারক হইয়াও বৈদিক স্বর্গকামিতার উপর কঠিন ভাষা প্রয়োগেও কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহার বৌদ্ধমতে আবার কি ভয়?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রকার গ্রীক্ ভাষার এক এক গ্রন্থের উপর সমস্ত জীবন দেন, সেই প্রকার এক এক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উপর জীবন উৎসর্গ করুন; অনেক আলোক জগতে আসিবে। বিশেষতঃ এ মহাভারত ভারত-

ইতিহাসের অমূল্য গ্রন্থ। ইহা অত্যুক্তি নহে যে এ পর্যন্ত উক্ত সর্বপ্রধান গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতে উত্তমরূপে অধীতই হয় নাই।

বক্তৃতার পর অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন। অনেকেই বলিলেন, স্বামীজি যাহা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের সম্মত এবং স্বামীজিকে আমরা বলি যে সংস্কৃত-প্রত্নতত্ত্বের আর সে দিন নাই। এখন নবীন সংস্কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের মত অধিকাংশই স্বামীজির সদৃশ এবং ভারতের কিম্বদন্তী পুরাণাদিতে যে বাস্তব ইতিহাস রহিয়াছে, তাহাও আমরা বিশ্বাস করি।

শেষে বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় অন্য সকল বিষয়ে অনুমোদন করিয়া, এক গীতার মহাভারত-সমসাময়িকত্বে দ্বৈধমত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু প্রমাণ-প্রয়োগ এইমাত্র করিলেন যে অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে গীতা মহাভারতের অঙ্গ নহে।

অধিবেশনের লিপি পুস্তকে উক্ত বক্তৃতার সারাংশ ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত হইবে।

ভাব্বার কথা।

ঠাকুর দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শন লাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে—বুঝি আদান প্রদান সামঞ্জস্য করিবার জন্ত—গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়া চোবেজি ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজি মন্দিরের পূজারী, পাহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ্ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষপটু এবং অন্যান্ত আরও অনেক সদ্‌গুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজির কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজির বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে "উত্থায়হৃদিলীয়ন্তে"—হইল। তরুণ অরুণ কিরণ বর্ণ ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধারী চোবেজি আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজির সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্ম্ম-বাড়ীর কড়া মাজার ন্যায় মর্ম্মস্পর্শীস্বরে নারদ, ভরত,

হনুমান, নায়ক, কলাবন্ত প্রভৃতির সপিণ্ডিকরণ করিতেছে। সচ্চিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিগ্রহস্বরূপ পুরুষকে মর্ম্মাহত চোবেজি তীব্র বিরক্তি-ব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "বলি বাপুহে—ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ ?" ক্ষিপ্র উত্তর এলো "সুর তানের আমার আবশ্যক কিহে ? আমি ঠাকুরজির মন ভিজুচ্ছি"।" চোবেজি—"হুঁ, ঠাকুরজি এমনই আহাম্মক কি না ? পাগল তুই—আমাকেই ভিজুতে পারিস্ নি—ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মুর্খ ?"

ভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন—তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার করিব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুসী ; থেকে থেকে বিকট চীৎকার—আমি প্রভুর শরণাগত আমার আবার ভয় কি ? আমার কি আর কিছু কর্ত্তে হবে ? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথা গুলা খুব বিট্‌কেল আওয়াজে বারম্বার বলতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার উপর মাঝে মাঝে পূর্ব্বোক্ত স্বরে জানানও আছে, যে তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ! এ ভক্তির জোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু চারটা আহাম্মকও তাই

ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর অত একটিও দুষ্টামি ছাড়্তে প্রস্তুত নন। বলি ঠাকুরজি কি এমনই আহম্মক? এতে যে আমরাই ভুলিনি!!

ভোলা পুরি বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর অধ্যায় সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরির চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখ দুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো মরে ঢিপি হয়ে যায় তাতেই বা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন! তাঁর সামনে বলবান দুর্ব্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলা পুরি—"আত্মা মরেণও না মারেণও না" এই শ্রুতি বাক্যের গভীর অর্থ সাগরে ডুবে যান। কোনও প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তে ভোলাপুরি বড়ই নারাজ। পেড়াপিড়ি কর্লে জবাব দেন যে, পূর্ব্ব জন্মে ও সব সেরে এসেছেন। এক জায়গায় ঘা পড়্লে কিন্তু ভোলাপুরির আত্মৈক্যানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয়,—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন, তখন পুরিজির মতে গৃহস্থের মত ঘৃণ্যজীব জগতে আর কেহই থাকে

না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না সে গ্রাম যে কেন মুহূর্ত্ত মাত্রও ধরণীর ভার বৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

ইনিও ঠাকুরজিকে আমাদের চেয়েও আহাম্মক ঠাওরেছেন।

বলি, রামচরণ! তুমি লেখা পড়া শিখ্লেনা, ব্যবসা বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেশা ভাঙ্ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়্তে পার না, কি করে জীবিকা কর বল দেখি? রাম চরণ—"সে সোজা কথা মহাশয়—আমি সকলকে উপদেশ করি।"

রামচরণ ঠাকুরজিকে কি ঠাওরেছেন?

লক্ষ্ণৌ সহরে মহরমের ভারী ধুম। বড় মসজেদ্ ইমাম-বাড়ায় ঝঁাকেঝমক রোশ্নির বাহার দেখে কে। বেশুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান কেরাণী, য়াহুদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা ছত্রিশ বর্ণের হাজারো জাতের লোকের ভিড় আজ বকরম দেখ্তে। লক্ষ্ণৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম্ হাঁসেন হোঁসেনের

নামে আর্ত্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতি ফাটান যদি থার কাতরাণি কার বা হৃদয় ভেদ না করে ? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূরগ্রাম হইতে দুই জন রাজ-পুত তামাসা দেখ্‌তে হাজির। ঠাকুর সাহেব্‌দের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমীদারের হয়ে থাকে—বিদ্যাস্থানে অন্যে বচ। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্‌ গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সমেত লক্ষ্ণৌ নবাবের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ বেরঙ সহর পসন্দ ঢঙ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারে নি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্ব্বদা শীকার করে, জমাখরচ কড়াক্রান্ আর কেল্লায় মজবুত দিল্।

ঠাকুরদ্বয় ত ফটক পার হয়ে মসজেদ মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ্ খাড়া দেখ্‌ছ ওকে আগে পাঁচ জুতা মার, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্ত্তিটা কার ? জবাব এলো ঐ মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্ত্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরৎ হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, এ শোক প্রকাশ। প্রহরী যায়লে, এ বিস্তৃত ব্যাখার পর ইয়েজিদমূর্ত্তি পাঁচ জুতার

জায়গায় বশ ত নিশ্চিত থাবে। কিন্তু কর্ম্মের বিচিত্রগতি—উল্টো সমঝ্‌লি রাম—ঠাকুরঘর গললগ্নকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েথিনমূর্ত্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি আর গদগদ স্বরে স্তুতি—"ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অস্ত ঠাকুর আর—কি দেখ্‌ব ? জল্‌ বাবা অজিদ্‌ দেবতা তো তুঁহি হায়, অল্‌ মারো শালো কো কি অস্তিত্ব বোধতা।" [ধন্য বাবা ইয়েথিধ, এমনি মেরেছো শালাদের—কি আজও কাঁদছে !!

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত ! আর সেথা নাই বা কি ? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মা,' বিষ্ণু, শিব, 'শক্তি, সূর্য্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচ দেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি —নাই কি ? আর বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে ত ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটী লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড ! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ডু, একশত হাত, দুশ পেট, পাঁচশ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্ত্তি খাড়া, সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে

কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটো ফুল ছুঁড়ে ফেল্লেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই যিনি দ্বারদেশে; আর ঐ যে বেদ বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, শাস্ত্র সকল দেখ্‌ছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেব-দেবের নাম কি?—উত্তর এলো, এঁর নাম "লোকাচার।" আমার লক্ষ্ণৌএর ঠাকুর সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল, "অল্‌ বাবা লোকাচার" অল্‌ মায়ো ইত্যাদি।

গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য্য—মহা পণ্ডিত, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটী অস্থি-চর্ম্মসার; বন্ধুরা বলে, তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে। আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে যেড়কুড়ি ছেলে হলে ঐরকম চেহারাই হয়ে থাকে। যাই হোক, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিষটীই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নখাগ্র পর্য্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বুকশক্তির গতা-গতিবিষয়ে তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুণ দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হতে মায় কাদা পুনর্ব্বিবাহ

দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কর্ত্তে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ প্রয়োগ—সে জে বালকেও বুঝ্‌তে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম্ম বুঝ্‌বার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকি সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। যেদা লেখাপড়ার চর্চ্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চম্‌চমে হয়ে উঠ্‌ছে, সকল জিনিষ বুঝ্‌তে চায়, চাখ্‌তে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে, তেমনি থাক। নাকে সরিষার তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা—বল্লে বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বস্‌তে হবে, চল্‌তে ফির্‌তে হবে, কি আপদ!! "বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল" বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর কর্ত্তে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যাল দলের আদর। জয়্ বাবা "অভ্যাস" জয়্ যাত্রো ইত্যাদি।

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি।

(সমালোচনা।)

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগের অধিনায়ক। যে ঋগ্বেদসংহিতা পূর্ব্বে সমগ্র কেহ চক্ষেও দেখিতে পাইত না, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিপুল ব্যয়ে ও অধ্যাপকের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে, এক্ষণে তাহা অতি সুন্দর রূপে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য। ভারতের দেশদেশান্তর হইতে সংগৃহীত হস্তলিপি পুঁথির অধিকাংশ অক্ষরগুলিই বিচিত্র এবং অনেক কথাই অশুদ্ধ; বিশেষ, মহাপণ্ডিত হইলেও বিদেশীর পক্ষে সে অক্ষরের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় এবং অতি সংক্ষিপ্ত জটিল ভাষ্যের বিশদ অর্থ বোধগম্য করা কি কঠিন, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের জীবনে ঋগ্বেদ-মুদ্রণ একটী প্রধান কার্য্য। এতদ্ব্যতীত আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বনবাস, জীবন-যাপন, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, অধ্যাপকের কল্পনায় ভারতবর্ষ

বেদ-ঘোষ-প্রতিধ্বনিত ও যজ্ঞ-ধূম-পূরিত-গগণ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি-বহুল, ঘরে ঘরে গার্গী মৈত্রেয়ী-সুশোভিত, শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রের নিয়মাবলী-পরিচালিত, তাহা নহে। আধুনিক বিজাতি-বিধর্ম্মি-পদ-দলিত, লুপ্তাচার, লুপ্তক্রিয়, ম্রিয়মাণ ভারতের কোন্ কোণে কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাও অধ্যাপক সদা জাগরূক হইয়া সংবাদ রাখেন। এদেশের অনেক অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান, অধ্যাপকের পদযুগল কখনও ভারত-মৃত্তিকা-সংলগ্ন হয় নাই বলিয়া ভারতবাসীর রীতিনীতি আচার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতে নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, আজীবন এদেশে বাস করিলেও অথবা এদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও যে প্রকার সঙ্গ, সেই সামাজিক শ্রেণীর বিশেষ বিবরণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীর বিষয়ে, অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান রাজপুরুষকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। বিশেষ; জাতি-বিভাগে বিভক্ত এই বিপুল সমাজে একজাতির পক্ষে অন্য জাতির আচারাদি বিশিষ্টরূপে জানাই কত দুরূহ। কিছুদিন হইল, কোনও প্রসিদ্ধ অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর লিখিত "ভারতাধিবাস"-নামধেয় পুস্তকে এরূপ এক অধ্যায় দেখিয়াছি—"দেশীয় পরিবার-রহস্য"। মনুষ্যহৃদয়ে রহস্য-

আনেকটা প্রবল বলিয়াই বোধ হয়, ঐ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখি যে, আংগ্লো ইণ্ডিয়ান-দিগের তাঁহার মেথর, মেথরাণী ও মেথরাণীর জার-ঘটিত ঘটনা-বিশেষ বর্ণনা করিয়া স্বজাতিবৃন্দের দেশীয় জীবন-রহস্য সম্বন্ধে উগ্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বিশেষ প্রয়াসী এবং ঐ পুস্তকের আংগ্লো ইণ্ডিয়ান সমাজে সমাদর দেখিয়া লেখক যে সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থ, তাহাও বোধ হয়। শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ, আর বলি কি ? তবে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে" ইত্যাদি। যাক্, অপ্রাসঙ্গিক কথা ; তবে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের আধুনিক ভারতবর্ষের দেশদেশান্তরের রীতি, নীতি ও সাময়িক ঘটনা-জ্ঞান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ।

বিশেষতঃ, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভারতের কোথায় কি নূতন তরঙ্গ উঠিতেছে, অধ্যাপক সেগুলি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অবেক্ষণ করেন এবং পাশ্চাত্য জগৎ যাহাতে সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্ত হয়, তাহারও বিশেষ চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজ, থিয়সফি সম্প্রদায়, অধ্যাপকের লেখনী-মুখে প্রশংসিত বা নিন্দিত হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ-ভারত-নামক পত্রিকাদ্বয়ে

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও উপদেশের প্রচার দেখিয়া এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাঠে, রামকৃষ্ণ জীবন তাঁহাকে আকর্ষণ করে। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান হাউসের লাইব্রেরিয়ান্ টনি মহোদয় লিখিত রামকৃষ্ণ-চরিত ও ইংলণ্ডীয় এসিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া অধ্যাপক নাইনটিন্থসেঞ্চুরি নামক ইংরাজি ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, বহু শতাব্দী যাবৎ পূর্ব্ব মনীষিগণের ও আধুনিক কালে পাশ্চাত্য বিদ্বৎগণের প্রতিধ্বনিমাত্রকারী ভারতবর্ষে নূতন ভাব নূতন ভাষায় নূতন মহাশক্তি পরিপূরিত করিয়া সম্পাত-কারি নূতন মহাপুরুষ সহজেই তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিলেন। পূর্ব্বতন ঋষি মুনি মহাপুরুষদিগের কথা তিনি শাস্ত্র-পাঠে বিলক্ষণই অবগত ছিলেন, তবে এ যুগে, এ ভারতে আবার তাহা হওয়া কি সম্ভব? রামকৃষ্ণজীবনী এ প্রশ্নের যেন মীমাংসা করিয়া দিল। আর ভারত-গত-প্রাণ মহাত্মার ভারতের ভাবী মঙ্গলের, ভাবী উন্নতির আশা-লতার মূলে বারি সিঞ্চন করিয়া নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল।

পাশ্চাত্য জগতে কতকগুলি মহাত্মা আছেন, যাঁহারা নিশ্চিত ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ম্যাক্সমুলারের অপেক্ষা ভারত হিতৈষী ইউরোপখণ্ডে আছেন কি না, জানি না। ম্যাক্সমুলার যে শুধু ভারত-হিতৈষী, তাহা নহেন, ভারতের দর্শন-শাস্ত্রে, ভারতের ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা; অদ্বৈতবাদ যে, ধর্ম্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া, তাহা অধ্যাপক সর্ব্ব সমক্ষে বারম্বার স্বীকার করিয়াছেন। যে সংসারবাদ দেহাত্মবাদী খ্রীষ্টিয়ানের বিভীষিকাপ্রদ, তাহাও তিনি স্বীয় অনুভূতি-সিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, এমন কি, বোধ হয় যে, ইতিপূর্ব্ব জন্ম তাঁহার ভারতেই ছিল এবং পাছে ভারতে আসিলে এই বৃদ্ধ শরীর সহসা সমুপস্থিত পূর্ব্ব স্মৃতিরাশির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে, অধুনা এই ভয়ই ভারতাগমনের প্রধান প্রতিবন্ধক। তবে গৃহস্থ মানুষ, যিনিই হউন, সকল দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। যখন সর্ব্বত্যাগী উদাসীনকেও অতি বিশুদ্ধ জানিয়াও লোকনিন্দিত আচারের অনুষ্ঠানে কম্পিত-কলেবর দেখা যায়, শূকরী-বিষ্ঠা মুখে বলিয়াও যখন প্রতিষ্ঠালাভ, অপ্রতিষ্ঠার ভয়, মহা উগ্রতাপসেরও কার্য্যপ্রণালীর পরিচালক, তখন সর্ব্বদা লোকসংগ্রহেচ্ছু, বহুলোকপূজ্য গৃহস্থের যে, অতি সাবধানে নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে

হইবে, ইহাতে কি বিচিত্রতা ? যোগ-শক্তি ইত্যাদি গুরু বিষয়-সম্বন্ধেও যে অধ্যাপক একবারে অবিশ্বাসী, তাহাও নহেন।

"দার্শনিক-পূর্ণ ভারত-ভূমিতে যে সকল ধর্ম্ম-তরঙ্গ উঠিয়াছে," তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ ম্যাক্সমুলার প্রকাশ করেন, কিন্তু, আক্ষেপের বিষয়, অনেকে "উহার মর্ম্ম বুঝিতে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং অত্যন্ত অযথা বর্ণন করিয়াছেন।" ইহা প্রতিবিধানের জন্য এবং এসোটেরিক বৌদ্ধমত, থিয়সফি প্রভৃতি বিজাতীয় নামের পশ্চাতে "ভারতবাসী সাধুসন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্রিয়াপূর্ণ অদ্ভুত যে সকল উপন্যাস ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদ-পত্র সমূহে উপস্থিত হইতেছে, তাহারও মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে," ইহা দেখাইবার জন্য অর্থাৎ ভারতবর্ষ যেসকল পক্ষী জাতির ন্যায় আকাশে উড্ডীয়মান বা পদতলে জলসঞ্চরণকারী অথবা মৎস্যানুকারী জলজীবী, মন্ত্র, তন্ত্র, ছিটা-ফোঁটা যোগে রোগাপনয়নকারী সিদ্ধিবলে ধনীদিগের বংশরক্ষক, স্বর্ণাদি-সৃষ্টিকারী, সাধুগণের নিবাস-ভূমি, তাহা নহে, প্রকৃত আধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ, প্রকৃত ব্রহ্মবিৎ, প্রকৃত যোগী, প্রকৃত ভক্ত, যে একেবারে বিরল নহেন এবং সমস্ত আর্য্যজাতি এখনও এতদূর পশুতার প্রাপ্ত হয় নাই যে,

শেষোক্ত নরদেবগণকে ছাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত বাজিকরগণের পদলেহন করিতে আপামর সাধারণ দিবানিশি ব্যস্ত, ইহাই ইউরোপীয় মনীষিগণকে জানাইবার জন্ত, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অগষ্ট সংখ্যক নাইনটীন্থ সেঞ্চুরি নামক পত্রিকায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার "প্রকৃত মহাত্মা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের অবতারণা করেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বুধমণ্ডলী অতি সমাদরে এ প্রবন্ধটী পাঠ করেন এবং উহার বিষয়ীভূত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অনেকেই আস্থাবান হইয়াছেন,—আর সুফল হইয়াছে কি? এই ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্য জাতিরা নরমাংস-ভোজী, নগ্ন-দেহ, বলপূর্ব্বক বিধবা-দাহনকারী, শিশুঘাতী, মূর্খ, কাপুরুষ, সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অন্ধতা-পরিপূর্ণ, পশুপ্রায় নরজাতিপূর্ণ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন—এই ধারণার প্রধান সহায়, পাদরী সাহেবগণও বলিতে লজ্জা হয় দুঃখ হয়, কতকগুলি আমাদের স্বদেশী। এই দুই দলের প্রবল উদ্যোগে যে একটী অন্ধতামসের জাল পাশ্চাত্যদেশ-নিবাসীদের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়াছিল, সেইটি ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল। যে দেশে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ-দেবের ন্যায়-লোকগুরুর উদয়, সে দেশ কি বাস্তবিক যে প্রকার কদাচার-পূর্ণ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, সেই

প্রকার ? অথবা কুচক্রীরা আমাদিগকে এতদিন ভারতের তথ্য সম্বন্ধে মহাভ্রমে পাতিত করিয়া রাখিয়াছিল ? স্বতই এ প্রশ্ন পাশ্চাত্য মনে সমুদিত।

পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম্ম-দর্শন-সাহিত্যসাম্রাজ্যের চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যখন শ্রীরামকৃষ্ণচরিত অতি ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদিগের কল্যাণের জন্য সংক্ষেপে নাইনটীন্থ সেঞ্চুরীতে প্রকাশ করিলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

মিশনরী মহাশয়েরা হিন্দু দেবদেবীর অযথা বর্ণন করিয়া তাঁহাদের উপাসকদিগের মধ্যে যে যথার্থ ধার্ম্মিকলোক কখন উদ্ভূত হইতে পারেন না, এইটি প্রমাণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন ; প্রবল বন্যার সমক্ষে তৃণগুচ্ছের ন্যায় তাহা ভাসিয়া গেল, আর পূর্ব্বোক্ত স্বদেশী সম্প্রদায় শ্রীরাম-কৃষ্ণের শক্তি-সম্প্রসারণরূপ প্রবল অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ঐশী শক্তির সমক্ষে জীবের শক্তি কি ?

অবশ্যই দুই দিক হইতেই এক প্রবল আক্রমণ বৃদ্ধ অধ্যাপকের উপর পতিত হইল, বৃদ্ধ কিন্তু হটিবার নহেন। এ সংগ্রামে তিনি বহুবার পারোত্তীর্ণ। এবারও হেলায়

উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ক্ষুদ্র আতভায়িগণকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করিবার জন্যও "যে মহাপুরুষ ইদানীং ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যথায় তাঁহার শিষ্যেরা মহোৎসাহে তাঁহার উপদেশ প্রচার করিতেছেন এবং বহুব্যক্তিকে এমন কি, খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্য হইতেও অনেককে শ্রীরামকৃষ্ণ-মতে আনয়ন করিয়াছেন" "একথা আমাদের নিকট আশ্চর্য্যবৎ এবং কষ্টে বিশ্বাস-যোগ্য" "তথাপি প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্ম-পিপাসা বলবতী, প্রত্যেক হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্ম-ক্ষুধা বিদ্যমান, যাহা বিলম্বে বা শীঘ্রই শান্ত হইতে চাহে"। "এই সকল ক্ষুধার্ত্ত প্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্ম বাহিরের কোন শাসনাধীনে আসে না" বলিয়াই অমৃতবৎ গ্রাহ্য হয়। "অতএব, রামকৃষ্ণ-ধর্ম্মানুচারীদের যে প্রবল সংখ্যা আমরা শুনিতে পাই, তাহা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত যদ্যপিও হয়,—তথাপি যে ধর্ম্ম আধুনিক সময়ে এতাদৃশী সিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং যাহা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ সভ্যতার সহিত জগতের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্ম ও দর্শন বলিয়া ঘোষণা করে, এবং যাহার নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদশেষ— বেদের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহা অস্মদাদির অভিনবত্বের সহিত সমসংযোগার্হ।" সেই মহাপুরুষ ও তাঁহার ধর্ম্ম যাহাতে সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে, সেইজন্য তাঁহার

অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথম অংশে মহাত্মাপুরুষ, আশ্রম-বিভাগ বোস, দয়ানন্দ সরস্বতী, পবহারী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের-জীবনীর অবতরণ করা হইয়াছে।

অধ্যাপকের বড়ই ভয়, পাছে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে, যে দোষ আপনা হইতেই আসে—অনুরাগ বা বিরাগাধিক্যে অতিরঞ্জিত হওয়া—সেই দোষ এ জীবনীতেও প্রবেশ করে। তজ্জন্য ঘটনাবলী সংগ্রহে তাঁহার বিশেষ সাবধানতা। বর্তমান লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র দাস। তৎসঙ্কলিত রামকৃষ্ণ-জীবনীর উপাদান যে অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি-উদূখলে বিশেষ কুট্টিত হইলেও ভক্তির আগ্রহে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহাও বলিতে ম্যাক্স-মূলার ভুলেন নাই, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ দোষোদ্ঘোষণ করিয়া অধ্যাপককে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর মুখে দুই চারিটি কঠোর, মধুর কথা যাহা কিছু বলিয়াছেন,

তাহাও পরশ্রী-কাতর ও ঈর্ষ্যা-পূর্ণ বাঙ্গালীর বিশেষ মনোযোগের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় পুস্তক-মধ্যে অবস্থিত। এ জীবনীতে সভয় ঐতিহাসিকের প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া লেখা, "প্রকৃত মহাত্মা" নামক প্রবন্ধে যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, এবার তাহা অনেক যত্নে আবরিত। একদিকে মিসনরি, অন্য দিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল, এ উভয় আপদের মধ্য দিয়া অধ্যাপকের নৌকা চলিয়াছে। "প্রকৃত মহাত্মা" উভয় পক্ষ হইতে বহু ভর্ৎসনা, বহু কঠোর বাণী অধ্যাপকের উপর আনে; আনন্দের বিষয়, তাহার প্রত্যুত্তরের চেষ্টাও নাই, ইতরতা নাই, আর গালাগালি সভ্য ইংলণ্ডের ভদ্র-লেখক কখনও করেন না, কিন্তু বর্ষীয়ান্ মহা পণ্ডিতের উপযুক্ত ধীর-গম্ভীর, বিদ্বেষ-শূন্য অথচ বজ্রবৎ দৃঢ় স্বরে মহাপুরুষের অলৌকিক হৃদয়োত্থিত অমানব ভাবের উপর যে আক্ষেপ হইয়াছিল, তাহা অপসারিত করিয়াছেন।

আক্ষেপ গুলিও আমাদের বিস্ময়-কর বটে,—ব্রাহ্ম-সমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি অলৌকিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট; আমরা যাহাকে অশ্লীল

বলি, এমন কথার সমাবেশ তাহাতে থাকিলেও তাঁহার অপূর্ব্ব বালবৎ কামগন্ধ-হীনতার জন্য ঐ সকল শব্দ-প্রয়োগ দোষের না হইয়া ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে, অথচ ইহাই একটী প্রবল আক্ষেপ !!

অপর আক্ষেপ এই যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে অধ্যাপক উত্তর দিতেছেন, যে, তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করেন এবং যতদিন মর্ত্ত্যধামে ছিলেন, তাঁহার সদৃশা স্ত্রী পতিকে গুরুভাবে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় পরমানন্দে তাঁহার উপদেশ অনুসারে আকৌমার ব্রহ্মচারিণী-রূপে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। আরও বলেন যে, শরীর-সম্বন্ধ না হইলে কি বিবাহে এতই অসুখ ? “আর শরীর সম্বন্ধ না থাকিলেও ব্রহ্মচারি পতি ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভাগিনী করিয়া পরম পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, একথা উক্ত ব্রত-ধারণকারী ইউরোপনিবাসীদিগের সম্বন্ধে কার্য্যে পরিণত হয় নাই, মনে করিতে পারি, কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে ঐ প্রকার কামজিৎ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।” অধ্যাপকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ; তিনি বিজাতি, বিদেশী হইয়া আমাদের একমাত্র ধর্ম্মসহায়

ব্রহ্মচর্য্য বুঝিতে পারেন এবং ভারতবর্ষে যে এখনও বিরল নহে, বিশ্বাস করেন, আর আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর-সম্বন্ধ বই আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না!! যাদৃশী ভাবনা যস্য ইত্যাদি।

আবার অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন না—ইহাতে অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর; তিনি বলেন, শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী।

আহা! কি মিষ্ট কথা—শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের কৃপা-পাত্রী বেশ্যা অম্বাপালী ও হজরৎ ঈশার দয়া-প্রাপ্তা সামরীয়া নারীর কথা মনে পড়ে। আরও অভিযোগ, মদ্য-পানের উপরও তাঁহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না, এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁর সুরে কেন কথা কহিতেন না, আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ, আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না!!!

আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের

আদর্শে জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে !! যাক্, রসাতলে, যদি ঐ প্রকার নীতি-সহায়ে উঠিতে হয়।

জীবনী অপেক্ষা উক্তি-সংগ্রহ এ পুস্তকের অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ উক্তিগুলি যে সমস্ত পৃথিবীর ইংরাজী-ভাষী পাঠকের অনেক ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, তাহা পুস্তকের ক্ষিপ্র বিক্রয় দেখিয়াই অনুমিত হয়। উক্তিগুলি তাঁহার শ্রীমুখের বাণী বলিয়া মহাশক্তিপূর্ণ এবং তজ্জন্যই নিশ্চিত সর্ব্বদেশে আপনাদের ঐশীশক্তি বিকাশ করিবে। বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের জন্ম কর্ম্ম অলৌকিক এবং তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যও অত্যাশ্চর্য্য।

আর আমরা? যে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার স্বীয় জন্ম দ্বারা পবিত্র, কর্ম্ম দ্বারা উন্নত এবং বাণী দ্বারা রাজ-জাতিরও প্রীতি-দৃষ্টি আমাদের উপর পাতিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার জন্য করিতেছি কি? সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না, কিন্তু সময় বিশেষে তথাপিও বলিতে হয়, আমরা কেহ কেহ বুঝিতেছি, আমাদের লাভ, কিন্তু ঐ স্থানেই শেষ। ঐ উপদেশ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করাও আমাদের অসাধ্য। যে জ্ঞান ভক্তির মহাতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ

উত্তোলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অঙ্গবিসর্জ্জন করা ত দূরের কথা। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, এ খেলা, বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে, শুধু বুঝিলে হইবে কি? বোঝার প্রমাণ কার্য্যে। মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে। সকল জগত ভাবই ফলানুমেয়; কার্য্যে পরিণত কর, জগৎ দেখুক।

যাঁহারা আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত জানিয়া এই মূর্খ, দরিদ্র, পূজারি ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, যে দেশের এক মূর্খ পূজারি সপ্তসমুদ্র পার পর্য্যন্ত আপনাদের পিতৃপিতামহাগত সনাতন ধর্ম্মের জয়-ঘোষণা নিজ শক্তিবলে অত্যল্প কালেই প্রতিধ্বনিত করিল, সেই দেশের সর্ব্বলোকমান্য শূরবীর আপনারা মহাপণ্ডিত, আপনারা মনে করিলে আরও কত অদ্ভুত কার্য্য স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণের জন্য করিতে পারেন। তবে উঠুন, প্রকাশ হউন, দেখান মহাশক্তির খেলা, আমরা পুষ্প-চন্দন-হস্তে আপনাদের পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। আমরা মূর্খ, দরিদ্র, নগণ্য, বেশমাত্র-জীবী ভিক্ষুক; আপনারা মহারাজ, মহাবল, মহাকুল-প্রসূত, সর্ব্ব-বিদ্যাশ্রয়।

আপনারা উঠুন ; অগ্রণী হউন, পথ দেখান, জগতের হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগ দেখান, আমরা দাসের ন্যায় পশ্চাদ্গমন করি, আর যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণনামের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে দাস-জাতি-সুলভ ঈর্ষা ও দ্বেষে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে, বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈর-প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে, হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা। যদি এই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মহাধর্ম্মতরঙ্গ—যাহার শুভ্রশিখরে এই মহাপুরুষমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, আমাদের ধন, জন বা প্রতিষ্ঠা-লাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, মহামায়ার অপ্রতিহত নিয়ম-প্রভাবে অচিরাৎ এ তরঙ্গ মহাজলে অনন্তকালের জন্য লীন হইয়া যাইবে, আর যদি জগদম্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ এই বন্যা জগৎ উপপ্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য মায়ের শক্তিসঞ্চার রোধ কর ?

সম্পূর্ণ।